গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ৮ সংখ্যা ২০ - ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

‘এক রাষ্ট্র এক ভাষা’

অমিত শাহের বক্তব্য দুরভিসন্ধিমূলক

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৫ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

গত কাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ যেভাবে ‘এক রাষ্ট্র এক ভাষা’র পক্ষে সওয়াল করে হিন্দিকে জাতীয় ভাষা হিসেবে স্থাপন করার কথা বলেছেন, তা অবাস্তব ও অনৈতিহাসিক শুধু নয়, অত্যন্ত বিপজ্জনক। হিন্দি সহ সকল ভাষাই যেহেতু দেশের জনগণের ভাষা, তাই আমরা কোনও ভাষার বিরোধী তো নয়ই বরং সকল ভাষার বিকাশের পক্ষপাতী। কিন্তু ইংরেজির মতো উন্নত আন্তর্জাতিক ভাষা যখন ভারতেরই একটি ভাষা, সেজন্য আমরা বরাবর মাতৃভাষা এবং সকল ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে ও প্রশাসনিক কাজকর্মে সংযোগকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজি— এই দ্বি-ভাষা নীতির কথাই বলেছি এবং আজও তাকেই যথার্থ বলে মনে করি। ভারতবর্ষের মতো একটি বহু ভাষাভাষী মানুষের দেশে কোনও ভাষাকেই অপরাপর ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না, তা দিলে জনগণের মধ্যে তা অবধারিতভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে, জনগণের ঐক্য ও সংহতিতে গুরুতর আঘাত হানবে। এ দেশে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার সরকারি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের ঘটনা সকলেই জানেন। ফলে আমরা মনে করি, অমিত শাহের অভিমত দুরভিসন্ধিমূলক ও জনগণের ঐক্য-সংহতির বিরোধী।

জনগণের দাবি নিয়ে পথে নেমেছে এসইউসিআই (সি)

স্বাক্ষর দিয়ে আন্দোলনকে শক্তিশালী করুন

দেশ জুড়ে সর্বাত্মক সংকট। গরিবি বেকারিতে জর্জরিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের জীবনের পরতে পরতে আজ অন্ধকার। কোনও সরকার— কী কেন্দ্র, কী রাজ্য— কারওরই এতটুকু উদ্বেগ নেই। ফুঁসে ওঠা ক্ষোভ সামাল দিতে মাসে মাসে কিছু খয়রাতির দাক্ষিণ্য জনগণের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তারা ব্যস্ত ভোটের হিসাব কষতে। অথচ ভোটে সরকার পাল্টে যে মানুষের জীবনের সমস্যাগুলির সুরাহা হবে না তা আজ জলের মতো পরিষ্কার। অভিজ্ঞতা বলছে, কোনও শাসকই জনজীবনের দুর্দশা ঘোচাতে কাজের কাজ কিছু করবে না। তাই নিজেদের সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে জনগণকেই। ন্যায্য দাবি আদায়ের একমাত্র রাস্তা দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলে সরকারকে তা মানতে বাধ্য করা। সংকটে জর্জরিত সব স্তরের মানুষকেই সেই আন্দোলনে সামিল হতে হবে। এস ইউ সি আই (সি) সেই গণআন্দোলনেরই ডাক দিয়েছে। সাড়া দিচ্ছে মানুষ। রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে ১১ দফা দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান। কয়েক কোটি মানুষের সই নিয়ে ১৩ নভেম্বর রাজপথ অনুরণিত হবে নবান্ন এবং উত্তরকন্যার উদ্দেশে মহামিছিলের পদধ্বনিতে।

নবান্ন ও উত্তরকন্যা অভিযান

কী দাবি তুলেছে মানুষ? সকলেরই স্মরণে আছে, অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর দাবিতে ২০১৭ সালের ১৭ জুলাই সারা বাংলা সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল এস ইউ সি আই (সি)। দীর্ঘ ধারাবাহিক আন্দোলনের পর ডাকা এই ধর্মঘটকে সফল করতে সেদিন এ রাজ্যের কোটি কোটি মানুষ সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। আন্দোলনের চাপে শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা দ্রুত পাশ-ফেল চালু করবেন। অথচ গভীর বিস্ময়ে মানুষ লক্ষ করছে, প্রথম শ্রেণি থেকে তো দূরের কথা, আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল চালু করার যে ঘোষণা করেছে, তাও এ রাজ্যে চালু করতে কোনওরকম উদ্যোগ তৃণমূল সরকার নেয়নি। প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল না থাকায় প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে— বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে বারে বারে সামনে আসা সত্ত্বেও সরকারের কোনওরকম সদর্থক ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না।

নারী নির্যাতন-নারীপাচারে পশ্চিমবঙ্গ দেশে প্রথম স্থানের অধিকারী। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত অন্যান্য রাজ্যের মতোই এ রাজ্যে ঘটে চলেছে অসংখ্য নারীধর্ষণ, শিশু ধর্ষণের ঘটনা, চলছে অবাধে নারীপাচার। প্রায় সমস্ত ধর্ষণের ঘটনার সাথে যুক্ত দুষ্কৃতীদের মদ্যপ অবস্থায় থাকার বিষয়টি সামনে

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ মাশুল বাড়ানোর আইন বিজেপির হাতেই তৈরি

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ মাশুল কমানোর দাবিতে বিজেপি হঠাৎ কলকাতার ধর্মতলায় বিক্ষোভ দেখাল ১১ সেপ্টেম্বর। সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারও পেল। কিন্তু সত্যিই কি বিজেপি বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির বিরোধী?

জনজীবনে বিদ্যুতের ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য। এমনিতেই চড়া মাশুল ও পরিষেবার নানা অব্যবস্থার কারণে দেশের দরিদ্র-মধ্যবিত্ত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জেরবার অবস্থা। তার উপর ১৯৪৮ সালের বিদ্যুৎ আইন বাতিল করে ২০০৩ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার নতুন বিদ্যুৎ আইন প্রণয়ন করে। পুরনো আইনে জনসাধারণের জন্য যতটুকু পরিষেবার ব্যবস্থা ছিল, সে সব তুলে দিয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবার কোম্পানিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের ব্যবস্থা করে দেয় বিজেপি সরকার। বিদ্যুৎ ব্যবস্থাটিকে উৎপাদন, পরিবহণ ও বণ্টন— এই তিনটি কোম্পানিতে ভেঙে দিয়ে প্রতিটি কোম্পানিকে কমপক্ষে ১৬ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৩১ শতাংশ হারে মুনাফা করার ব্যবস্থা করে দেয় বিজেপি।

বর্তমানে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বিদ্যুৎ

দুয়ের পাতায় দেখুন

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসক দপ্তরে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ। ১৬ সেপ্টেম্বর

পরিষেবায় চূড়ান্ত গাফিলতির বিরুদ্ধে

মেট্রো ভবনে বিক্ষোভ

কলকাতা মেট্রোর সদর দপ্তরের উদ্দেশে বিক্ষোভ মিছিল। ১৬ সেপ্টেম্বর

কলকাতা মেট্রো রেল পরিষেবায় চলছে চূড়ান্ত গাফিলতি। লক্ষ লক্ষ যাত্রীকে প্রাণ বাজি রেখে নিত্যদিন যাতায়াত করতে হচ্ছে এবং দুর্ঘটনাও ঘটছে প্রায়শই। এর প্রতিবাদে এবং ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো, পুরনো রেক বাতিল করে নতুন রেক চালু, শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ ও ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাজের গাফিলতিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে (মালিক ও ভাড়াটে) উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও স্থায়ী পুনর্বাসনের দাবিতে ১৬ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে মেট্রো ভবনে বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত হয়। তার আগে সমস্ত মেট্রো স্টেশনে যাত্রীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। এক প্রতিনিধি দল ১০ হাজার ৭৫টি স্বাক্ষর সংবলিত প্রতিবাদপত্র পার্ক স্ট্রিটের মেট্রো ভবনে চেয়ারম্যানের হাতে তুলে দেয়। অপর এক প্রতিনিধিদল ওয়াটগঞ্জে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো রেলের চেয়ারম্যানের হাতে দাবিপত্র তুলে দেয়। এই কর্মসূচিতে যাত্রীদের বিপুল সাড়া পাওয়া যায়।

মাশুল বাড়ানোর আইন বিজেপিরই তৈরি

একের পাতার পর

মাশুল বাড়ানোই শুধু নয়, কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন মোদি সরকার বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর উপর 'সংশোধনী ২০১৮' সংসদে এনেছে, যা আইনে পরিণত হলে কর্পোরেট বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের পোয়াবারো হবে। পাশাপাশি সাধারণ দেশবাসীর ঘাড়ে চাপবে মারাত্মক দামবৃদ্ধির বোঝা। সংশোধনীতে বলা হয়েছে, আগামী তিন বছরের মধ্যে দেশের সকলের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ মাশুল সমান করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ বিদ্যুতের সাহায্যে ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে যে আদানি, আম্বানি, টাটা, বিড়লারা— তাদের মাশুল কমানো হবে, আর বিপিএল সহ সর্বস্তরের সাধারণ গ্রাহকদের মাশুল বাড়ানো হবে বিপুল হারে। এই বিলে বিদ্যুৎ-কে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। এর ফলে রাজ্য সরকারগুলি এতদিন অবস্থা অনুযায়ী যে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারত, কিংবা ভরতুকি দিত, তার আর উপায় থাকবে না। এই সংশোধনী আইনে পরিণত হলে দিল্লি রাজ্য সরকারের মতো গরিব গৃহস্থদের, কিংবা কিছু রাজ্যে গরিব কৃষকদের বিনামূল্যে বা স্বল্প মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। বিদ্যুৎ কোম্পানি গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়ায় অবহেলা করলে তাদের জরিমানা করে গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থাও কার্যত তুলে দেওয়ার প্রস্তাব আছে ওই সংশোধনীতে। ২০০৩-এর আইনে যে তিনস্তরের কোম্পানির কথা ছিল, তাকে জেলা এমনকি থানা স্তরে ভেঙে দিয়ে স্তরে স্তরে বেসরকারি ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়ে নিচুস্তর পর্যন্ত মুনাফা লুটের পাকা বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে সংশোধনীতে।

বাস্তবে এসবের নিট ফল কী? সাধারণ গ্রাহকদের জন্য মাশুল বৃদ্ধি ঘটবে বিপুল পরিমাণে। অথচ সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়ার কোনও দায় কোম্পানিগুলোর থাকবে না। জনগণকে শুষে নিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের মুনাফা লুটের এই নীলনক্সা তৈরি করছে মোদি সরকার। তাহলে, কী করে এ-রাজ্যে বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিজেপি বিক্ষোভ দেখায়? ন্যূনতম সততা থাকলে তারা একাজ করত না।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানেন, বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি (অ্যাবেকা) গ্রাহকদের সংগঠিত করে ধারাবাহিক ভাবে আন্দোলন করছে। রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ, ধরনা, অবরোধ, আইন অমান্য, গণ আমরণ অনশন, নিষ্প্রদীপ আন্দোলন, বিল বয়কট প্রভৃতি লাগাতার সংগঠিত হয়েছে। লাঠি-গুলির বন্যা বইয়ে সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মিথ্যা মামলায় জেলে পুরেও পূর্বতন সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার ন্যায়সঙ্গত এই আন্দোলন দমিয়ে দিতে পারেনি, বরং বহু দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। একইভাবে বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস সরকারও অ্যাবেকার আন্দোলন দমন করতে পুলিশি অত্যাচার চালিয়ে গ্রাহকদের রক্তে হাত রাঙিয়েছে। কিন্তু আন্দোলনের চাপে ইচ্ছামতো মাশুল বৃদ্ধি করতে পারেনি। ন্যায়সঙ্গত দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে লাগাতার আন্দোলন পরিচালনার মধ্য দিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণ গভীর আস্থা স্থাপন করেছে অ্যাবেকার উপর। সেই কারণেই অ্যাবেকার আন্দোলন সফল করতে দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের উদ্যোগ ও সক্রিয়তা সহজেই চোখে পড়ে। ভয়াবহ বিদ্যুৎ মাশুল অবিলম্বে কমানোর দাবিতে অ্যাবেকার ডাকে ১৬ সেপ্টেম্বর রাজ্যের সকল জেলায় জেলাশাসক দপ্তরে ব্যাপক গ্রাহক বিক্ষোভ করে রাজ্য সরকার ও বিদ্যুৎ কোম্পানির উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টির কর্মসূচি সংগঠিত করেছে। ৩০ সেপ্টেম্বর ডাক দেওয়া হয়েছে কলকাতায় সিইএসসি দপ্তরে ব্যাপক গ্রাহক বিক্ষোভের। সর্বত্র বিপুল সাড়া পড়েছে।

দাবি আদায়ে সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী এই আন্দোলনের দিক থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার হীন চেষ্টায় এবং এই ভাবে বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের সুবিধা করে দেওয়া ও সাধারণ গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করার জন্য বিজেপি সাজানো আন্দোলন করছে এবং জনগণের সাথে প্রতারণা করছে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য তৃণমূলকে সরিয়ে গদি দখল করা, যার সাথে সাধারণ গ্রাহকস্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই।

উত্তরপ্রদেশে বিদ্যুতের দাম বাড়াচ্ছে বিজেপি সরকার

উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকার ১২ শতাংশ হারে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে। এর সাথে উচ্চহারে ফিক্সড চার্জ, বিদ্যুৎ বিলের উপর ৫ শতাংশ কর বসানোর ফলে সাধারণ গৃহস্থ, কৃষক এবং ছোট ব্যবসা ও শিল্পের নাভিশ্বাস উঠছে। এর প্রতিবাদে এসইউসিআই(সি) ৯ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশ রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেয় (ছবি ঃ জৌনপুর)। এলাহাবাদে ওই দিন জেলাশাসক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড রাজবেন্দ্র সিং। জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আন্দোলনকে শক্তিশালী করুন

একের পাতার পর

এলেও, মদ বা মাদক নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে নতুন করে মদের দোকান খোলার সরকারি ছাড়পত্র দিয়ে চলেছে রাজ্য সরকার। গ্রাম-শহর সর্বত্র এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশেও চলছে মদের রমরমা ব্যবসা, যা ছাত্র-যুবদের অনৈতিক, মূল্যবোধহীন নিকৃষ্ট জীবনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশের মতোই এ রাজ্যেও ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে অসংখ্য ঋণগ্রস্ত চাষি। তৃণমূল সরকারের সময়কালে এ রাজ্যে ২০০০-এর বেশি ঋণগ্রস্ত চাষির মৃত্যু ঘটেছে।

বন্যা-খরায় লক্ষ লক্ষ চাষি প্রতিবছর সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। সার-বীজ-কীটনাশক-সেচ সহ জ্বালানি তেল বা কৃষি বিদ্যুতের দাম কমানোর প্রশ্নে কেন্দ্র ও রাজ্য কোনও সরকারেরই কোনও চেষ্টা নেই।

পূর্বতন সিপিএম সরকারের ৩৪ বছরের অপশাসনের বিরুদ্ধে এ রাজ্যের মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। গড়ে উঠেছিল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ইতিহাস তৈরি করা প্রতিরোধ আন্দোলন। যাকে ভিত্তি করে বহু আশা-ভরসা নিয়ে মানুষ তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিল। আশাহত সেই মানুষগুলোই আজ আবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন। কাটমানি, চিটফান্ড, নিয়োগ-দুর্নীতি সহ বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারিতে যুক্ত শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে চলছে প্রবল গণবিক্ষোভ। রাজ্য সরকার শিক্ষা-স্বাস্থ্যের বেহাল পরিকাঠামো সহ জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধানের উপযুক্ত পদক্ষেপ না করে, ভোটব্যাঙ্ক বাড়ানোর লক্ষ্যে কন্যাশ্রী-যুবশ্রী-রূপশ্রীর মতো শুধুমাত্র কিছু প্রকল্প গ্রহণ করে দান-খয়রাতির রাজনীতিকেই লালন-পালন করে চলেছে।

রাজ্যের এই যখন হাল, তখন পুনরায় কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয়ে বিজেপি একদিকে ধর্ম বর্ণ জাত পাতকে কেন্দ্র করে কোথাও এনআরসি করে জাতিগত কোথাও ভাষাগত বিভেদ তৈরি করে মানুষে মানুষে সংঘাত বাধাচ্ছে। পাশাপাশি একের পর এক সর্বনাশা নীতি ও আইন চালু করে জনজীবনের সংকট বাড়িয়ে তুলছে। এর বিরুদ্ধে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে একজোট করার বদলে তৃণমূল সরকারও নরম হিন্দুত্ববাদের প্রতিযোগিতার ক্ষতিকর রাস্তায় নেমেছে। বিজেপিকে রুখতে তারা ইমাম ও পুরোহিত ভাতা চালু করা, হনুমান পুজো, রামনবমী পালন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকেই উৎসাহিত করছে যা আদতে সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকেই শক্তিশালী করতে সাহায্য করছে। এর বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলন গড়ে তোলার পরিবর্তে সিপিএম-সিপিআই-এর মতো বামদলগুলি পুনরায় ক্ষমতা ফিরে পেতে বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণির দল কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যা দিয়ে তার সাথে সুবিধাবাদী নির্বাচনী জোট গড়ে তোলার মরিয়া প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষের জীবনের সংকট দূর করা নয়, তাদের একমাত্র লক্ষ্য যে কোনও ভাবে হোক ভোটে জেতা।

এই অবস্থায় একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) একদিকে রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতি, অন্যদিকে কেন্দ্রের আর্থিক ও সাম্প্রদায়িক নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন সংগঠিত করে চলেছে। পাশ-ফেল চালু করা, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, শ্রমিক-কৃষকের জীবনের সমস্যা, বেকারি দূর করা, নারী নির্যাতন ও মদের লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ সহ ১১ দফা দাবিতে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান। ১৩ নভেম্বর দক্ষিণবঙ্গে নবান্নে ও উত্তরবঙ্গে উত্তরকন্যাতে মহামিছিল করে দাবিপত্র পেশ করবে লক্ষ লক্ষ মানুষ। তারা জানিয়ে দেবে লক্ষ মানুষের এই বজ্রনির্ঘোষকে উপেক্ষা করার চেষ্টা হলে আন্দোলন হয়ে উঠবে অপ্রতিরোধ্য।

জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাবড়ায় দলের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সমর্থক কমরেড বুলু মিত্র ২৪ আগস্ট হায়দরাবাদের নিমস হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে ব্লাড সুগার সহ কিডনি, সেপসিস ও নানা জটিল রোগে ভুগছিলেন। কমরেড বুলু মিত্র ১৯৮১ সালে ১৬ বছর বয়সে বিয়ের পর দলের সংস্পর্শে আসেন। মূলত এস ইউ সি আই (সি) দলে যে উন্নত রুচি-সংস্কৃতির চর্চা চলে, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি নিজের জীবনকে পরিবর্তিত করতে থাকেন। তৎকালীন হাবড়া পার্টি সেন্টারের ঠিক পাশেই তাঁর পরিবার ভাড়া থাকত। হাবড়া ও সন্নিহিত অঞ্চলে পার্টি বিকশিত হওয়ার সেই দিনগুলিতে সংগঠনের অভুক্ত নেতা ও কর্মীদের নিজ উদ্যোগে খাওয়ানো ও দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে কখন যে তিনি পার্টি-সেন্টারের অভিভাবক হয়ে গিয়েছিলেন, তা নিজেও বুঝতে পারেননি। জীবনে চলার পথে শেষদিন পর্যন্ত হাবড়া পার্টি সেন্টারের সাথে আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। পার্টি সেন্টারের ভাল-মন্দ মিশে গিয়েছিল তাঁর পারিবারিক ভাল-মন্দের সাথে। এই অঞ্চলে পার্টির বিকাশে তাঁর এই সংগ্রাম সর্বস্তরের কমরেডদের মনের গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে। প্রচলিত অর্থে পার্টি কর্মী না হয়েও বাস্তবে তিনি ছিলেন দলের সর্বক্ষণের কর্মীর মতোই।

বিপ্লবী রাজনীতির সংগ্রামে প্রয়োজন উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি— কমরেড শিবদাস ঘোষের এই শিক্ষাটি মূর্ত হয়ে উঠেছিল কমরেড বুলু মিত্রের জীবনে। পড়াশোনা ও তত্ত্বগত জ্ঞান না থাকলেও তাঁর জীবনের ক্রিয়াই জানিয়ে দিত পার্টির প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও গভীর দায়িত্ববোধের কথা।

কমরেড বুলু মিত্রের মৃত্যুতে সর্বস্তরের কমরেডদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। ২৫ আগস্ট রাতে তাঁর মরদেহ হাবড়া পার্টি সেন্টারে পৌঁছালে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের পক্ষে কমরেড গোপাল বিশ্বাস, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শংকর ঘোষ, হাবড়া লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড তুষার ঘোষ, পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, গণসংগঠন ও কমসোমলের নেতৃবৃন্দ এবং তাঁর আত্মীয় ও পাড়া-প্রতিবেশীরা। ৮ সেপ্টেম্বর উত্তর হাবড়া আর পি স্কুলে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন পার্টির জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস। কমরেড বুলু মিত্রের জীবনের সংগ্রামী দিকগুলি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন কমরেড শংকর ঘোষ। কমরেড বুলু মিত্রের গুণমুগ্ধ অন্যান্য ব্যক্তিরাও তাঁর স্মৃতিচারণা করেন।

কমরেড বুলু মিত্র লাল সেলাম

সিঙ্গুরের উর্বর বহুফসলি জমিকে ‘খণ্ডহর’ বানালো কারা

কলকাতা থেকে রওনা হয়ে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে রতনপুর মোড় পেরিয়ে ছুটে চলা দ্রুতগতির গাড়ি থেকে আজও চোখ চলে যায় সেই একখণ্ড জমির দিকে। সেই জমি যাকে ঘিরে ২০০৬-০৭ সাল থেকে বারবার সারা ভারতের বিবেক উত্তাল হয়েছে।

সিঙ্গুর সেদিন প্রশ্ন তুলেছে, এই ভারত নাকি জনকল্যাণমূলক একটি রাষ্ট্র? তাহলে তার রক্ষক কেন্দ্র-রাজ্য সরকার কৃষক রমণীকে চুলের মুঠি ধরে পিটিয়ে, তার সন্তানদের খুন করে, ধর্ষণ করে, বৃহৎ পুঁজিমালিকের জন্য জমি কেড়ে নিতে পারে কি? প্রশ্ন তুলেছে, সরকার তুমি প্রায় ৬ হাজার পরিবারের কমপক্ষে ৩০ হাজার মানুষের আশ্রয়-রুটি রুজি কেড়ে নিয়ে কত লোকের কর্মসংস্থান করবে? উত্তরে সেদিনের রাজ্য সরকার বিদ্রূপ করেছে, লাঠি পিটিয়ে, অত্যাচার করে, ধর্ষণ করে, গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে রাজকুমার ভুল, তাপসী মালিকদের তাজা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। তাই সেদিন যে চাষিরা জীবনের তোয়াক্কা না করে রুখে দাঁড়িয়েছেন বন্দুকধারী পুলিশের সামনে, সেদিনের দর্পিত শাসক সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর হাতে লাঞ্ছিতা হয়েও যে কৃষক রমণীরা লড়েছেন শেষ শক্তি থাকা পর্যন্ত, তাঁদের কাছে সিঙ্গুর এক মহাতীর্থ। সারা ভারতের জল-জঙ্গল-জমি রক্ষার আন্দোলনে সামিল নির্যাতিত কৃষক-শ্রমিকের কাছে সিঙ্গুর এক শক্তিদায়ী ইতিহাসের নাম। কর্পোরেট মালিকের স্বার্থে মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার তথাকথিত উন্নয়ন যজ্ঞের নির্বাক বলি হওয়ার বদলে রুখে দাঁড়াতে শেখায় যে নাম, তাই হল সিঙ্গুর। আর নন্দীগ্রামে ১০ হাজার একর জমি দখল করে সালিমদের হাতে তুলে দিয়ে এসইজেড করতে চেয়েছিল সিপিএম সরকার। মানুষতা রুখেছে রক্ত দিয়ে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামই কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করেছে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে নতুন আইন করতে।

আজ বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার কিছু সিট পেয়েছে বলে সিঙ্গুরের এই ইতিহাস বদলে যেতে পারে না। বিজেপি নেতারা সিঙ্গুরের এই আত্মদানের খবরটুকুও রাখেন না। অথচ তাঁরাই এখন শিল্প শিল্প করে প্রবল দরদ দেখাতে ব্যস্ত। বিজেপি নেতারা সিঙ্গুরে টাটাকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রায় তাদের পায়ে পড়ার সংকল্প ঘোষণা করছেন। যোগ্য সঙ্গত দিচ্ছে সিপিএম। শিল্পায়ন আর চাকরির দাবিতে নবান্ন অভিযান উপলক্ষে ১৩ সেপ্টেম্বরের গণশক্তি পত্রিকায় তারা সিঙ্গুরকে উল্লেখ করেছে ‘খণ্ডহর’ (পোড়ো বাড়ি) হিসাবে। লিখেছে, ভেঙে দেওয়া কারখানার জমিতে এখন শুধু কাশ ফুল। চাষিরা কাশফুল চায় না, চায় চাকরি। প্রচার হচ্ছে সিঙ্গুরে টাটার কারখানা হতে পারল না বলেই বাংলায় শিল্পায়ন স্তব্ধ। ওটি হলেই একেবারে হাজার হাজার কারখানায় বাংলা নাকি ভরে যেত! সমাধান হয়ে যেতে পারত ভয়াবহ বেকার সমস্যার!

অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস আজ রাজ্যের মসনদে। সিঙ্গুরের সংগ্রামী মানুষের রক্ত-ঘাম, তাপসী আর রাজকুমারের জীবনদানকে ভোটের বাক্সে পুঁজি করে তারা রাজা-উজির বনেছে। তারা লড়াকু সিঙ্গুরকে ভয় পায়। তারা চায় সিঙ্গুর থাকুক দু’টাকা কেজি চালের উমেদার হয়ে, মাথা নিচু করে। এই সুযোগে চলছে লড়াইয়ের সেই ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র। মাত্র ১৩-১৪ বছর আগেও যে জমি সতেজ সবুজ হয়ে থাকত— ধান, আলু, সব্জি, পাটের খেত হাজার হাজার মানুষকে দিত নিশ্চিন্ততার আশ্বাস। তাকে খণ্ডহর বানালো কারা? সিঙ্গুরের কৃষকরা! যে কৃষকরমণী পুলিশের বুটের তলায় পিষে যেতে যেতেও জমি ছাড়বো না বলেছিলেন— তিনি! সিঙ্গুরের দাবি নিয়ে লড়াই করা এরাজ্যের লক্ষ লক্ষ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ! নাকি আসলে এই জমিকে নষ্ট করেছে ‘টাটার কেশাগ্র স্পর্শ করতে দেব না’ বলে যারা মানুষের রক্তে টাটার লাভের ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিল সেই সিপিএম পরিচালিত তৎকালীন রাজ্য সরকার! তাকে সাহায্য করেছে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সরকার! তার সাথে এর দায় বর্তায় তৃণমূল নেতৃত্বের উপরেও। কারণ তারাই অনশনের ধুয়ো তুলে ২০০৬-এর প্রতিরোধ আন্দোলনকে ৪ ডিসেম্বর থেকে সিঙ্গুরের বাইরে নিয়ে চলে গিয়েছিল। না হলে টাটাদের হয়ে সরকার জমি ঘিরতেই পারত না। সিঙ্গুরের মানুষকে নিয়ে প্রথম থেকেই কৃষিজমি রক্ষা কমিটি নামে গণকমিটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিল এস ইউ সি আই (সি)। তাতে সাধারণ মানুষ যেমন ছিলেন, এস ইউ সি আই (সি) এবং তৃণমূলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা, এমনকি সিপিএমের সাধারণ সমর্থকরাও ছিলেন। এস ইউ সি আই (সি)-এর বক্তব্য ছিল রাজ্যের রাজনৈতিক নেতারা কমিটিকে সাহায্য করতে পরামর্শ দেবে, কিন্তু আন্দোলন পরিচালনা করবে কমিটিই। তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্ব প্রথমে এই আন্দোলনে আসতেই চায়নি। কিন্তু পরে আন্দোলনকে দখল করতে তারা তাদের প্রচার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল নেত্রীকেই সিঙ্গুরের মুখ করে তোলে। গণকমিটিকে ঠেলে দেয় পিছনে। তার পরিণামে যে চাষিরা জমি দখল রুখে দিয়েছিলেন, তাঁরা নেত্রীর অনশন দেখে থমকে গেলেন, উর্বর কৃষিজমি নষ্ট করতে পারল সরকার।

তৃণমূল সরকারে বসার পরেই এস ইউ সি আই (সি) দাবি তুলেছিল আন্দোলনের মাধ্যমে সংগঠিত কৃষকরা তাঁদের জমি দখল করুন, সরকার তাদের আইনি সহায়তা দিক। কিন্তু সরকারে বসেই কর্পোরেট মালিকদের মন পাওয়ার আশায় তৃণমূল আন্দোলনকে ভয় পেতে শুরু করে। তারা সিঙ্গুরের জমির প্রশ্নটাকে দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ায় ফাঁসিয়ে দেয়। আন্দোলনকে ভোটের বাক্সে টেনে নিয়ে গিয়েই তাদের মোক্ষলাভ সম্পূর্ণ। তাই সিঙ্গুরের লড়াইয়ের প্রধান শক্তি ছিলেন যাঁরা, সেই কৃষক রমণীদের, সেই কিশোর-যুবক-যুবতীদের নামগুলি ওরা ইতিহাস থেকে বাদ দিতে চায়।

যে কথাটা কেউ উচ্চারণ পর্যন্ত করছে না, সিঙ্গুরের লড়াইটা আদৌ শিল্প বনাম কৃষি ছিল না। সিঙ্গুরের লড়াই ছিল এক বর্বর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, যার কল্যাণে কর্পোরেট একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা চাইলেই যে কোনও মানুষের জমি, ভিটেমাটি, বনজঙ্গল, প্রাকৃতিক যে কোনও সম্পদকে দখল করতে পারে, মানুষকে যথেচ্ছ উচ্ছেদ করতে পারে। শিল্পের বিরোধিতা সিঙ্গুর করেনি, তারা দাবি তুলেছিল, বহুফসলি উর্বর জমিকে শিল্পের নামে ধ্বংস না করে লক্ষ লক্ষ একর অনাবাদী, পতিত, অকৃষি জমিতে শিল্পের পরিকাঠামো গড়ে উঠুক। বন্ধ কলকারখানার হাজার হাজার একর জমিকে উদ্ধার করে সেখানে শিল্প গড়ুক সরকার। সরকারের কাছে সিঙ্গুরের দাবি ছিল শ্রমনিবিড় শিল্প পরিকাঠামোর। সিঙ্গুর চেয়েছিল শিল্প গড়ার নামে অতিরিক্ত জমি কেড়ে নিয়ে সেখানে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসার ফন্দি বন্ধ হোক। সেদিন সিঙ্গুর আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে এনেছিল— অত্যন্ত উর্বর বহুফসলি জমি অফুরন্ত নয়। এমন জমি গড়তে লাগে শত বছর, নষ্ট করা যায় একদিনে। সিঙ্গুর আন্দোলন সেদিন সুনির্দিষ্টভাবে দেখিয়েছিল শিল্পায়নের ধুয়ো তুলে হাজার হাজার একর জমি একচেটিয়া দৈত্যাকার পুঁজির মালিকরা দখল করতে চাইছে একদিকে জমি-বাড়ি অর্থাৎ রিয়েল এস্টেটের ব্যবসার জন্য, অন্যদিকে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি ফসলের বাজারে নিজেদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য কায়েমের ধূর্ত পরিকল্পনায়। আর তার জন্য সরকার এত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় টাটাদের জমি দিয়েছিল ৪৫ বছরে ৮০০০ টাকা একর হিসাবে। শর্ত ছিল, জল, বিদ্যুৎ, রাস্তা সহ সব পরিকাঠামো বিনা পয়সায় দেবে সরকার। টাটারা বিদ্যুৎ পাবে ৩ টাকা ইউনিট দরে এবং তা ৫ বছর বাড়বে না। যদিও তখন পশ্চিমবঙ্গে গৃহস্থরা বিদ্যুতের দাম দিতেন প্রায় ৬ টাকা প্রতি ইউনিট। টাটাদের ভ্যাট, কর্পোরেট সার্ভিস ট্যাক্স, কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্স সব মকুব হয়েছিল। ১ শতাংশ সুদে ২০০ কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা ছিল। কথা ছিল তাও তারা শোধ করা শুরু করবে ২১ বছর পর থেকে। অর্থাৎ জনগণের ঘাড় ভেঙে আদায় করা ট্যাক্সের টাকাতেই ব্যবসা করবে টাটারা। টাকা জনগণের, লাভ টাটাদের!

সিঙ্গুরের মানুষ সেদিনই দাবি তুলেছিলেন, ১৮৯৪ সালের সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের জমি অধিগ্রহণ আইন বদলাক সরকার। দাবি ছিল, জনস্বার্থে সরকারকে যদি কোনও জমি অধিগ্রহণ করতেই হয়, শুধু জমির মালিক নয়, বহু দশক ধরে যাঁরা জমির উপর নির্ভরশীল সেই ভাগচাষি ও খেতমজুরদের শুধু ক্ষতিপূরণ নয় তাদের যথাযথ পুনর্বাসন এবং জীবিকার সঠিক ব্যবস্থা করেই একমাত্র তা করতে হবে। সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকার বলেছিল, টাটার মতো একচেটিয়া মালিকের লাভের জন্য জমি কেড়ে নেওয়াটাই জনস্বার্থ। কারণ তাতে নাকি কর্মসংস্থান হবে। দেশের ছেলে-মেয়েরা চাকরি পাবে। যদিও পরে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এই তথাকথিত জনস্বার্থের অজুহাত খারিজ হয়ে গেছে। আর নৈতিকতার দিক থেকে সিঙ্গুর প্রশ্ন তুলেছিল অত্যাধুনিক মোটর গাড়ি শিল্পে ১০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে বড়জোর ৩০০ লোকের কাজ হতে পারে। তার জন্য এমন একটি জনবহুল এবং উর্বর কৃষি জমির এলাকাকে বেছে নেওয়া হবে কেন? প্রায় ৩০ হাজার মানুষকে উচ্ছেদ করে কোন উপকারটি হবে? সরকার উত্তর দিয়েছিল টাটার বাবু সাহেবদের বাগানের মালি, বাসনমাজার লোক, রান্নার লোক, জুতো পালিশের লোক লাগবে। ওটাও কর্মসংস্থান! সম্পন্ন চাষি এবং জমিতে সোনা ফলিয়ে সচ্ছল খেতমজুর-ভাগচাষিদের জন্য এমন শিল্প-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাই সরকার করেছিল! সিঙ্গুর তা ঘৃণায় ফিরিয়ে দিয়েছে।

সিঙ্গুর থেকে উঠে ন্যানো কারখানা যেখানে গিয়েছিল সেই গুজরাটের সানন্দ এলাকার কী হাল? সানন্দ কারখানায় ন্যানো উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ। সানন্দ মোটর হাব এখন বিদেশি গাড়ির যন্ত্রাংশ জোড়ার কাজই মূলত করে। এমনিতেই গাড়ি শিল্পে এখন প্রবল মন্দা, ফলে সেখানেও কাজ নেই। বিজেপি সরকার টাটাদের দিয়েছিল ০.১ শতাংশ সুদে ৯ হাজার কোটি টাকা ঋণ, ২২ বছর বাদে তা শোধ করার কথা। টাটারা টাকা নিয়ে লাভ ঘরে তুলে ফেলেছে। কারখানা রুগ্ন ফলে সেটাও মকুবই হবে। কিন্তু জমিদাতা উত্তর কোটপুরা, ছিরোরি সহ সাতটি গ্রামের মানুষের কিছুই জোটেনি। প্রথম কিছুদিন ৬ থেকে ৭ হাজার টাকায় টাটার কারখানায় তাদের কাজ জুটেছিল। এখন টাটারা স্থানীয়দের আর নেয় না। বেশিরভাগ কর্মীই সেখানে কন্ট্রাকচুয়াল। তাদের গড় বেতন ১০ হাজার টাকার বেশি নয়। যে জমি দিয়ে গ্রামের মানুষ ২০ লক্ষ টাকা পেয়েছে বলে বিজেপি প্রচার করে, সেই জমি এখন প্রোমোটাররা বেচছে ৫ কোটি টাকায়। গ্রামের মানুষের পানীয় জল, বিদ্যুৎ নেই। নর্মদা নদীর জল টাটার উপনগরীতে পৌঁছালেও গ্রামের বাসিন্দাদের সে জল পাওয়ার রাস্তা বন্ধ। কোটপুরার ১৮৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলও বন্ধের পথে। কারণ স্থানীয় বাসিন্দারা বেশিরভাগ পরিযায়ী শ্রমিকের দলে নাম লিখিয়েছেন (এনডি টিভি, ৩ ডিসেম্বর, ২০১৭)।

লাভ কি কারও হয়নি? টাটারা কারখানা না চালিয়েই টাকা পেয়ে গেছে, বিজেপির অফিস সাততলা হয়েছে, নেতাদের-প্রোমোটারদের একটার বদলে দু’তিনটি বিদেশি গাড়ি হয়েছে। আর মোটর কারখানার শ্রমিক? গ্রামের চাষি? সকলেই দিনে দিনে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হওয়ার পথে এগিয়েছে। সিঙ্গুর সে সত্যটা আগেই বুঝেছিল। এস ইউ সি আই (সি) তাদের কাছে সঠিক বক্তব্যটা তুলে ধরেছিল যে, আজকের যুগটাই পুঁজিবাদের সংকটের চরম অবস্থার যুগ। ফলে শিল্পায়ন, অর্থাৎ অবাধে কলকারখানা খোলা আজ একটা দিবাস্বপ্ন মাত্র। সারা দেশে লক্ষ লক্ষ কারখানা বন্ধ, শিল্পোৎপাদনের হার নেমেছে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি। বেকারি বেড়েছে ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ হারে। কোথায় হবে শিল্পায়ন? সেদিন সিপিএম সরকার যেমন মিথ্যা শিল্পায়নের গল্প বলে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল, আজ কেন্দ্রে বিজেপি রাজ্যে তৃণমূল একই কাজ করছে।

আজকের দিনে যেটুকু চাকরি আছে তাকে রক্ষা করতে কিংবা চাকরির দাবিতে নতুন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প গড়ার জন্য আন্দোলন ছাড়া উপায় নেই। তার জন্য চাই সঠিক নেতৃত্বে গণআন্দোলনের জোয়ার। ভোটের দিকে নজর রেখে, কংগ্রেসের মতো একচেটিয়া মালিকবন্ধু শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে যা সম্ভব নয়। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের কাছ থেকে চাকরির প্রতিশ্রুতি আদায় করতে গেলেও সেই আন্দোলনই দরকার যা টাটাদের উমেদারি করে শিল্প আনার ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দেয় না। দেয়, খাদ্য আন্দোলনের শহিদ থেকে শুরু করে ৯০ এর শহিদ মাধাই হালদারদের যথার্থ উত্তরসাধক হওয়ার ডাক।

জলপাইগুড়িতে মদবিরোধী বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি যাওয়ার পথে পড়ে কেরারপাড়া হল্টস্টেশন। রাতের ট্রেনে সেখানে নামার পরই যাত্রীরা মাতালদের তাণ্ডবের সম্মুখীন হন। সমস্ত স্টেশন চত্বরই চলে যায় মাতালদের দখলে। মহিলা যাত্রীরা ভয়ে কুঁকড়ে যান। আশেপাশের বাড়ির ছাত্রছাত্রীরাও এদের অকথ্য গালিগালাজ, চিৎকার ও চেঁচামেচিতে পড়াশুনা করতে পারে না। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে তৈরি হয়েছে নন্দনপুর (কেরারপাড়া হল্ট স্টেশন) মাদক বিরোধী কমিটি। মদ নিষিদ্ধ করা, বেআইনি মদ বিক্রেতাদের গ্রেপ্তার করা এবং স্টেশনে পুলিশি টহলদারির দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে কমিটি। ৩ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ির আবগারি দপ্তরে স্মারকলিপি দিয়েছে।

‘মদের প্রসার রুখবই’—গোসাবায় সোচ্চার মহিলারা

দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবায় রাঙাবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাগবাগান, রাজাপুর, রানিপুর, উত্তরজংলা প্রভৃতি গ্রামে যেখানে সেখানে, এমনকি স্কুলের পাশেও মদ বিক্রির ঠেক গজিয়ে উঠেছে। ফলে ঘরে ঘরে কিশোর-যুবক, এমনকি কোথাও কোথাও শিশুরাও নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। মদ্যপ স্বামীদের অত্যাচারে মহিলারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন। এই অবস্থায় স্থানীয় মহিলাদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা ‘মদবিরোধী কমিটি’ আন্দোলনে নামে। ৫ সেপ্টেম্বর শিশুসন্তানদের কোলে নিয়ে শতাধিক মহিলা গোসাবা থানা ও বিডিও-তে বিক্ষোভ দেখান। সাত সদস্যের প্রতিনিধিদল থানার ওসি-র সঙ্গে দেখা করে নিজেদের উৎকণ্ঠার কথা জানান এবং পাঁচশো গণস্বাক্ষর সহ একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। ওসি মদ বন্ধের আশ্বাস দেন এবং পরদিন পুলিশ গিয়ে এলাকার মদের ঠেকগুলি থেকে কয়েক কার্টন মদ বাজেয়াপ্ত করে এবং বিক্রেতাদের থানায় নিয়ে যায়। আন্দোলনের এই সফলতায় এলাকায় উৎসাহ দেখা দেয় এবং আরও কয়েকটি গ্রামে আন্দোলনের কমিটি গড়ে ওঠে।

মদের প্রসারের বিরুদ্ধে লিটল আন্দামানের রবীন্দ্রনগরে এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে নাগরিক সভা

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের অবস্থান-বিক্ষোভ

ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের কালা সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, অবিলম্বে বেতন সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের দাবিতে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংরক্ষিত ভাণ্ডারে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে ৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার বিবাদী বাগে অবস্থান-বিক্ষোভ হয়। এই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন গৌরীশঙ্কর দাস, বঙ্কিমচন্দ্র বেরা, চণ্ডী ব্যানার্জী, সোমনাথ মাইতি, তপন বিশ্বাস, রতন কর্মকার, সোমনাথ পাল, ইউসুফ মোল্লা, তপন মির, বরুণ ঘোষ প্রমুখ।

চর্ম শিল্পী ইউনিয়নের স্মারকলিপি বিডিওকে

আলিপুরদুয়ার জেলা চর্ম শিল্পী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। চর্ম শিল্পীদের সামাজিক স্বীকৃতি, স্থায়ী জায়গা ও শেডের ব্যবস্থা, বার্ধক্য ভাতা ও বিধবা ভাতার দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দাবিগুলি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হবে বলে বিডিও আশ্বাস দিয়েছেন।

ইসকো শ্রমিকদের কনভেনশন

আসানসোলে জেলা গ্রন্থাগার হলে ইসকো এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ডাকে বহু শ্রমিকের উপস্থিতিতে ৮ সেপ্টেম্বর ‘বর্তমান অবস্থায় ইসকো শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ’ বিষয়ে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস সব্যসাচী গোস্বামী, বিশ্বনাথ মণ্ডল, লবকুমার মান্না, সোভম পণ্ডা, কপিল সিনহা। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এআইইউটিইউসি-র পশ্চিম বর্ধমান জেলার সহ সভাপতি কমরেড অমর চৌধুরী এবং সভাপতি ছিলেন সংগঠনের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সম্পাদক কমরেড বাবলা ভট্টাচার্য।

কয়লাখনি বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ধরনা

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কোল মাইনার্স ইউনিয়ন এবং কোলিয়ারি ওয়ার্কার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে ২৯ আগস্ট পশ্চিম বর্ধমানের সাঁকতোড়িয়ায় ইসিএল হেড কোয়ার্টারের সামনে ধরনায় অংশ নেন বহু শ্রমিক। তাঁরা দাবি করেন, কয়লাখনিকে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না। কোল ইন্ডিয়ার বেসরকারিকরণের চেষ্টা এবং শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে নেতৃবৃন্দ জেনারেল ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি দেন।

সরকারি কর্মচারীরা যৌথ আন্দোলনে

সরকারি কর্মচারী-আধিকারিক ও শিক্ষকদের ১৭টি সংগঠনের ডাকে ৪ সেপ্টেম্বর মিছিলে সামিল হন দেড় সহস্রাধিক কর্মচারী ও শিক্ষক। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে রানি রাসমণি রোড পর্যন্ত এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন কো-অর্ডিনেটর সত্যেন মজুমদার, অজয় সেনাপতি (অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়েস্টবেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিট্যান্টস) শুভাশিস দাস (পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন), অর্জুন সেনগুপ্ত (ওয়েস্টবেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-নবপর্যায়), বলয়শঙ্কর মিত্র (স্টিয়ারিং কমিটি), মলয় মুখার্জী (কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ-আইএনটিইউসি) প্রমুখ।

বকেয়া ডিএ অবিলম্বে দেওয়া ও পে-কমিশনের সুপারিশ জুন ২০১৬ থেকে কার্যকর করার দাবিতে এই মিছিলের গান্ধী মূর্তি পর্যন্ত যাওয়ার কথা থাকলেও পুলিশ রানি রাসমণি রোডেই তার গতিরোধ করে। সেখানের সভায় নেতৃবৃন্দ তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারের কর্মচারী বিরোধী ভূমিকার পাশাপাশি সিপিএম পরিচালিত কো-অর্ডিনেশন কমিটির আন্দোলন বিরোধিতারও নিন্দা করেন।

কোলাঘাটে বিডিও অফিস ঘেরাও জলবন্দি মানুষের

কোলাঘাট ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার দুর্গন্ধযুক্ত জমা জল দ্রুত নিষ্কাশন, সোয়াদিঘি-টোপা ড্রেনেজ-দেহাটি খাল সংস্কার, ব্লকের সমস্ত ভাঙাচোরা রাস্তা সংস্কার করে কংক্রিট করা, দুর্নীতি-দলবাজি বন্ধ করে সমস্ত গরিব মানুষের নাম বাংলা আবাস যোজনায় অন্তর্ভুক্তিকরণ সহ ১৫ দফা দাবিতে ৯ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (সি) দলের কোলাঘাট ব্লক কমিটির ডাকে দুই শতাধিক মানুষ বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান।

অন্যান্য দাবির মধ্যে ছিল, অবিলম্বে পানীয় জল প্রকল্প চালু, যোগীবেড়ে গণধর্ষিতা মৃত স্কুলছাত্রীর ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, মৃতের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, পরিবারটিকে বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পে গৃহ প্রদান, এলাকায় মদের দৌরাত্ম্য বন্ধ প্রভৃতি। বিডিও ১১ সেপ্টেম্বর এলাকা পরিদর্শন করে খালে পড়ে থাকা জঞ্জাল পরিষ্কার করার প্রতিশ্রুতি দিলে বিক্ষোভ প্রত্যাহৃত হয়।

ওইদিনই সেচ দপ্তরের পাঁশকুড়া-১ এবং ২ সাব-ডিভিশনের এস ডি ও স্থানীয় টোপা ড্রেনেজ-দেহাটী খাল এলাকা পরিদর্শন করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, দ্রুত জমা জল বের না করা হলে জাতীয় সড়ক অবরোধের কর্মসূচি নেওয়া হবে।

আইনশৃঙ্খলার অবনতির বিরুদ্ধে ব্যারাকপুরে ডেপুটেশন

কিছুদিন বিরতির পর ১ সেপ্টেম্বর পার্টি অফিস দখলকে কেন্দ্র করে ব্যারাকপুর মহকুমার শ্যামনগরে এবং জগদ্দলে আবার বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ বাধে। ২ সেপ্টেম্বর বিজেপির ডাকা বনধকে ঘিরেও ব্যাপক সংঘর্ষ, বোমাবাজি, হিংস্রতা ছড়িয়ে পড়ে। বহু মানুষ আহত হন, এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। ৬ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, কঠোর হাতে সমাজবিরোধীদের দমন করা এবং জনজীবন ও শ্রমিকদের নিরাপত্তার দাবিতে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারের দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস অমল সেন ও প্রদীপ চৌধুরী।

রেললাইন ও ব্রিজের দাবিতে নন্দীগ্রামে কনভেনশন

বাজকুল-নন্দীগ্রাম রেল লাইনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা এবং হলদি নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে ২৫ আগস্ট নন্দীগ্রাম বিএমটি শিক্ষানিকেতনে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ প্রবালকুমার মাইতি। বক্তব্য রাখেন, সমাজসেবী আব্দুল হাই খান, আইনজীবী জায়েদ হোসেন, সমাজসেবী পবিত্র জানা, প্রাক্তন শিক্ষক মাধবরঞ্জন গুড়িয়া, সাধন পাল, আনসার হোসেন, সবুজ প্রধান প্রমুখ। দাবিগুলির সমর্থনে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন নন্দীগ্রাম ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির বিশিষ্ট নেতা নন্দ পাত্র। আন্দোলনকে তীব্রতর করতে নাগরিক কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি হিসেবে ডাঃ প্রবলকুমার মাইতি, সহ সভাপতি নন্দ পাত্র, যুগ্ম সম্পাদক অনিরুদ্ধ প্রধান, আনসার হোসেন ও অফিস সম্পাদক হিসেবে বিমল মাইতি নির্বাচিত হন।

টালিগঞ্জ রেল স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলন, রেল অবরোধের ডাক

পূর্ব রেলের টালিগঞ্জ স্টেশনের যাত্রী পরিকাঠামো উন্নয়নে রেলকর্তৃপক্ষের চরম ঔদাসীন্যের প্রতিবাদে ১৭ সেপ্টেম্বর রেল অবরোধের ডাক দিল এস ইউ সি আই (সি)। পূর্ব রেলের বজবজ শাখায় টালিগঞ্জ স্টেশন দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী যাতায়াত করেন। রেলকর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এই স্টেশনে ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম তৈরি করলেও তাতে পৌঁছানোর জন্য কোনও পথ বানায়নি। ফলে যাত্রীদের রেল লাইন ধরে দীর্ঘপথ হেঁটে তাতে পৌঁছাতে হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানে ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ডাউনের দিকে ফুটব্রিজ বা সাবওয়ে নির্মাণ, রবীন্দ্র সরোবরের দিক থেকে চলাচলের রাস্তা ও টিকিট কাউন্টার তৈরি, ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা ট্রেনের উচ্চতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাড়ানো, ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ফুটব্রিজের কাছে টিকিট কাউন্টার খোলা প্রভৃতি দাবি নিয়ে এস ইউ সি আই (সি) লেক লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে টালিগঞ্জের স্টেশন মাস্টারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয় আগেই। শিয়ালদহের ডিআরএম সহ উচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানার জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে। এই কর্মসূচিতে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন জানাচ্ছেন। যাত্রী সাধারণের সমর্থনে ১৭ সেপ্টেম্বর রেল অবরোধের ডাক দেওয়া হয়।

কলকাতার ১নং বরোয় নাগরিক বিক্ষোভ

কলকাতা পুরসভার ১নং বরোর অধীনে ন'টি ওয়ার্ডের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, পর্যাপ্ত আলোর অভাব, ডাস্টবিন বা ভ্যাট নেই, শৌচাগার নেই, জমা জলের মধ্যে ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়ার সঙ্গে সহাবস্থান বাসিন্দাদের। এর প্রতিকারে এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে জোট বেঁধেছেন তাঁরা। দাবি তুলেছেন, অবিলম্বে চুনিবাবুর বাজার এলাকায় জলনিকাশির বন্দোবস্ত করতে হবে, বেলগাছিয়া অঞ্চলে পর্যাপ্ত আলো দিতে হবে, ঘোষবাগান এলাকায় বসাতে হবে ময়লা ফেলার ভ্যাট, খালপাড়ের বিস্তীর্ণ বসতি অঞ্চলে তৈরি করতে হবে শৌচাগার। এই দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ১১ সেপ্টেম্বর ১নং বরো দপ্তরে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার মানুষ। এস ইউ সি আই (সি)-র শ্যামপুকুর-কাশীপুর আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক ইমতিয়াজ আলমের নেতৃত্বে ৭ জনের এক প্রতিনিধিদল বরো চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে দাবিপত্র পেশ করে। চেয়ারম্যান সমস্যার কথা স্বীকার করে দ্রুত শৌচাগার তৈরি ও ভ্যাট বসানোর কাজ শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অন্য দাবিগুলিও বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

চাষিদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা জুড়ে কে কে এম এসের বিক্ষোভ

অতিবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতিপূরণ, বিনামূল্যে সার-বীজ-কীটনাশক সরবরাহ, কৃষি পেনশন, কৃষি ঋণ মকুব, কৃষিবন্ধু প্রকল্পের বকেয়া চেক বিলি, বর্গাদার-পাট্টাদার এবং রায়ত জমির অসমাপ্ত এল আর রেকর্ডের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, কেন্দ্রীয় আবাসের ক্ষেত্রে দলবাজি ও কাটমানি নেওয়া বন্ধ করা ইত্যাদি নানা দাবিতে এ আই কে কে এম এস দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির ডাকে ১১ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভ দেখান কৃষক-খেতমজুররা।

মথুরাপুর-২ নং ব্লকে দুই শতাধিক, ক্যানিং ব্লকে হাজার, কুলতলী ব্লকে সহস্রাধিক কৃষক ও খেতমজুর বিক্ষোভ মিছিল করেন এবং জেলার ব্লক অফিসগুলিতে ডেপুটেশন দেন। মথুরাপুর-২ নং ব্লকে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড রেণুপদ হালদার, ক্যানিং ব্লকে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস ইয়াহিয়া আখন্দ, নির্মল মণ্ডল, কুলতলী ব্লকে (ছবি) নেতৃত্ব দেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস মনোরঞ্জন পণ্ডিত ও বাপি মাইতি। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড সেখ খোদাবক্স। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন কমরেডস সওকত সরা, সহদেব মণ্ডল, আনসার সেখ, শঙ্কর মণ্ডল, কমল দাস প্রমুখ। ক্যানিং-এ বিডিও দপ্তরে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তি হয়। এরপর কমরেডস মুজিবর মণ্ডল, নির্মল মণ্ডল, খোকন আখন্দ, গোবিন্দ হালদার, প্রাণতোষ নস্কর, ইয়াদালী জমাদার ও কুদ্দুছ সরদারকে নিয়ে এক প্রতিনিধি দল বিডিও-র হাতে দাবিপত্র তুলে দেয়। এ ছাড়া মথুরাপুর-১নং এবং কুলপী ব্লকেও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

মুর্শিদাবাদে এ আই কে কে এম এস-এর বিক্ষোভ

মুর্শিদাবাদে ভয়ঙ্কর খরা পরিস্থিতি চলছে। পাট পচানোর জলের অভাবে দিশেহারা চাষিরা। নদী-নালা-খাল-বিল সংস্কারের অভাবে মজে গেছে। চাষিরা ফসলের লাভজনক দাম না পেয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তারা পাটের উৎপাদন খরচই তুলতে পারছে না। অথচ সার-বীজ-কীটনাশক-বিদ্যুতের দাম বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে খেতমজুরদের সারা বছর নিয়মিত কোনও কাজ নেই, ফলে সংসার চালানো দুষ্কর।

এর প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজদুর সংগঠন মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ৩০ আগস্ট জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় ও জেলা সম্পাদকের নেতৃত্বে ৫ জনের প্রতিনিধিদল জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। এদিন চার শতাধিক কৃষক-খেতমজুর বহরমপুরে ডিএম দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভ সভায় জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড অমল ঘোষ, সম্পাদক কমরেড মণিরুল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ দাবি জানান, ৭০০০ টাকা কুইন্টাল দরে পাট কিনতে হবে, পাট পচানোর জন্য জলের ব্যবস্থা করতে হবে, মুর্শিদাবাদকে খরা কবলিত জেলা হিসাবে ঘোষণা করতে হবে, জবকার্ড হোল্ডারদের ৩০০ টাকা মজুরি ও ২০০ দিন কাজ দিতে হবে এবং ২০০ দিনের মধ্যে ১০০ দিন মধ্য ও গরিব চাষিদের জমিতে কাজ করাতে হবে, খাল-বিল-নদী-নালাগুলি সংস্কার করতে হবে।

ধানের সহায়ক মূল্য ২৫০০ টাকা করার দাবি বর্ধমানে

ধানের সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি ২৫০০ টাকা করার দাবিতে পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসককে স্মারকলিপি দেয় এআইকেকেএমএস। ৪ সেপ্টেম্বর সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, অঞ্চলভিত্তিক ক্রয়কেন্দ্র খুলে চাষির কাছ থেকে সরকারকে সরাসরি ধান কিনতে হবে। সমস্ত কৃষিঋণ মকুবের দাবিও জানান সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। তাঁরা আরও দাবি করেন, পাটের সংগ্রহমূল্য কুইন্টাল প্রতি ৭ হাজার টাকা করতে হবে। এনরেগা প্রকল্পে ২০০ দিনের কাজ ও ৩০০ টাকা দৈনিক মজুরি দেওয়ার দাবি ও এনরেগার কাজকে গরিব ও মধ্য কৃষকের জমির কাজের সাথে যুক্ত করার দাবিও তোলেন তাঁরা। এছাড়াও পর্যাপ্ত সেচ, কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, সস্তায় সার-বীজ-কীটনাশক সরবরাহ সহ ১০ দফা দাবি তোলা হয়।

সিকিমে স্মরণসভা

গ্যাংটকের ভারগাঁও-তে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এবং শিবদাস ঘোষ স্মরণে ১১ আগস্ট সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন বি বি শর্মা। প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ

মহিষাদলে বিপ্লবী গোপীনন্দন গোস্বামীর মূর্তি স্থাপন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের বীর সৈনিক বিপ্লবী গোপীনন্দন গোস্বামীর জন্মশতবর্ষ (১৯১৯-২০১৯) উপলক্ষে মহিষাদলে ১-২ সেপ্টেম্বর অঙ্কন, সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং প্রবন্ধ পাঠ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২ সেপ্টেম্বর সকালে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং মহিষাদলের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীরা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নেন। পরে মহিষাদল রাজ হাই স্কুলের সামনে তাঁর আবক্ষমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও লোকসংস্কৃতি শিল্পী ড. প্রদ্যোৎকুমার মাইতি। ওই স্কুলেরই অডিটোরিয়ামে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ত্যাগ ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন তিনি। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপিকা অনুরূপা দাস। উপস্থিত ছিলেন সুব্রতকুমার মাইতি, পুলকচন্দ্র বাগ প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিপ্লবী গোপীনন্দন জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক তপন মাইতি।

মৎস্যজীবীদের হয়রানি না করার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল সরকার

সুন্দরবনের নদী ও খাঁড়িতে কয়েক লক্ষ গরিব মানুষ পুরুষানুক্রমে মাছ-কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন। কিন্তু বন সংরক্ষণ ও বন্য পশু সংরক্ষণের অজুহাতে সরকার বাস্তবে গরিব মানুষকেই মারছে। বনবিভাগের কর্মচারীরা দিনের পর দিন অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে মৎস্যজীবীদের উপর। নৌকা-জাল সহ মাছ ধরার সামগ্রী আটকে দিয়ে মিথ্যা কেসে হয়রানি করছে, কখনও মোটা টাকা জরিমানা করছে ও কখনও খাদ্য সামগ্রী-পানীয় জল-চিকিৎসার ওষুধ জলে ফেলে দিচ্ছে। ফেলে দিচ্ছে ধরা মাছ ও কাঁকড়াগুলিও। কখনও কখনও মারধরও করা হচ্ছে। বাঘ-কুমীরের কামড়ে মৃত্যু হলে সরকারি সাহায্যও মিলছে না।

সরকারের ফরমান, নৌকায় মেশিন বসিয়ে নদীতে মাছ ধরা যাবে না। সুন্দরবনে বড় বড় নদী আছে। সেখানে যন্ত্র চালিত নৌকা ছাড়া পাড়ি দেওয়া অসম্ভব। এই সব নদীতে আগে জলদস্যুরা দাঁড়ের নৌকায় আক্রমণ করে লক্ষ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায় করত। প্রাণেও মেরে দিত। যন্ত্রচালিত নৌকা আসার পর জলদস্যুদের আক্রমণ অনেকটা কমেছে।

মৎস্যজীবীদের দাবি, বিকল্প স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। যতদিন তা না করা যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত মাছ-কাঁকড়া অধিকার অধিকার বলবৎ রাখতে হবে। কিন্তু এই দাবি সরকারকে বার বার জানিয়েও প্রতিকার না হওয়ায় মৎস্যজীবীরা জীবন ও জীবিকার রক্ষার্থে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন।

তাঁদের ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে ২৪ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলাশাসক মৎস্যজীবী সংগঠন, বন বিভাগের আধিকারিক, জেলার সমস্ত বিডিও, এসডিও, এম এল এ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলাপরিষদের কর্মাধক্ষ্য, মৎস্য বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে মিটিং করেন। মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয় নতুন করে মৎস্যজীবীদের হয়রানি ও অত্যাচার করা হবে না, যন্ত্রচালিত নৌকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হবে। সিদ্ধান্ত হয় নতুন মেরিন লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রি ক্যাম্প করে অল্প সময়ের মধ্যে মৎস্যজীবীদের দেওয়া হবে।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত মৎস্য বিভাগ নতুন নতুন রেজিস্ট্রি ও লাইসেন্স দেওয়ার কোনও উদ্যোগ নেয়নি, উপরন্তু বন বিভাগের অত্যাচার ও হয়রানি বহুগুণ বেড়ে গেছে। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, বনদপ্তর দ্বারা আটক করা নৌকা, জাল ও মাছ ধরার সামগ্রী ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা ফেরত দেওয়া হয়নি। অত্যাচার চরম রূপ নেয় ৩০ আগস্ট। ওই দিন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা ডিএফও তার সমস্ত বাহিনী নিয়ে, দাঁড় ও মেশিনচালিত নৌকা নির্বিশেষে মৎস্যজীবীদের আটক করে। তাদের মারধর করে গভীর জঙ্গলে নামিয়ে দেয়। অনেককে মোটা টাকা জরিমানা করে। এই স্বৈরাচারের প্রতিবাদে ৩১ আগস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশন ও সাউথ সুন্দরবন ফিশারমেন অ্যান্ড ফিশ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে নামখানা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস, রামগঙ্গা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস, কুয়েমুড়ি বনিক্যাম্প, ঝড়খালী বিট অফিস, কুলতলি বিট অফিসে মা-বোন সহ শত শত মৎস্যজীবী বিক্ষোভ দেখান। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের নেতা এসইউসিআই(সি)-র প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার।

মৎস্যজীবীদের সামনে এই সরকারের ভূমিকা প্রতারকের, চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকের। একদিকে হাজার হাজার গরিব মানুষকে সরকার কাজ দিতে পারে না। অথচ নিজের উদ্যোগে যারা স্বনিযুক্ত হয়েছেন,উল্টে তাঁদের উপর সরকারি বাহিনী দিয়ে হামলা করায়। এই সরকার যে কত জনবিরোধী তা জীবন দিয়ে উপলব্ধি করছেন মৎস্যজীবীরা। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারে তফাৎ কোথায়?

কাজের দাবিতে জেলায় জেলায় যুব বিক্ষোভ

নদীয়া

নদীয়া ঃ সরকারি সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ এবং স্থায়ী চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত বেকারভাতা দিতে হবে, অবিলম্বে মদ নিষিদ্ধ করতে হবে— এ ধরনের নানা দাবি নিয়ে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ সংগঠিত করছে বিপ্লবী যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও। ১১ দফা দাবিতে ৩ সেপ্টেম্বর সংগঠনের নদীয়া জেলা কমিটি জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। শতাধিক যুবক বিক্ষোভে সামিল হন। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুপ্রিয় ভট্টাচার্য, জেলা সম্পাদক মসিকুর রহমান, জেলা সভাপতি শীতল দে বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বলেন,

আসানসোল

এই জেলাতে কয়েক হাজার শূন্যপদ অথচ নিয়োগ হচ্ছে না। কল্যাণী শিল্পাঞ্চল ধুঁকছে। এ দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নজর নেই। বক্তারা যুবকদের জয় শ্রীরামে না মজে চাকরির দাবিতে তীব্র যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসক দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করে।

পশ্চিম বর্ধমান ঃ সংগঠনের পশ্চিম বর্ধমান ইউনিট ১২ সেপ্টেম্বর আসানসোল জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় ও স্মারকলিপি দেয়। আসানসোল বিএনআর মোড়ে যুবকদের সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সোমনাথ কৈবর্ত্য এবং আনন্দরূপ রায়। হিন্দুস্থান কেবলস স্কুলের পুনরুজ্জীবন, নতুন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন, রূপনারায়ণপুরের জল সমস্যার সমাধান এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ক্ষুদিরাম সহ বাংলার বিশিষ্ট মনীষীদের মূর্তি স্থাপন করার দাবিও জানানো হয়।

কলকাতা ঃ ১২ সেপ্টেম্বর কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত যুব বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক সঞ্জয় বিশ্বাস ও সভাপতি সঙ্গীতা ভক্ত। বিক্ষোভ সভায় রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর বলেন, গত ৪৫ বছরের মধ্যে দেশে বেকারের সংখ্যা সর্বাধিক। চূড়ান্ত অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন। এসব থেকে মুখ ঘুরিয়ে দিতেই সরকার পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক বিভেদের ষড়যন্ত্র করছে, আর বেকার যুবকদের বলছে 'পকোড়া ভেজে' রোজগার কর। রাজ্য সরকারও যুবকদের কাজের ব্যবস্থা না করে 'চপ ভাজা'-র পরামর্শ দিচ্ছে। এভাবে দুই সরকারই চাকরি দেওয়ার দায়িত্ব এড়িয়ে চলছে।

সঙ্গীতা ভক্তের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল রাজ্য সরকারের লেবার কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি দেয়। কমিশনার ভয়াবহ বেকার সমস্যার কথা স্বীকার করেন এবং দাবির যৌক্তিকতা মেনে নেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রুপ-ডি রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েটিং লিস্টের প্রার্থীরাও এই বিক্ষোভে এবং প্রতিনিধি দলে ছিলেন।

পুরুলিয়া

কমিশনার বলেন, এই প্রার্থীদের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তিনি বোর্ডকে জানাবেন।

পুরুলিয়া ঃ সংগঠনের পুরুলিয়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। শতাধিক যুবকের মিছিল দপ্তরের গেটে পৌঁছলে সেখানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড সোমনাথ কৈবর্ত্য, বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড সন্তোষ গঁরাই, কমরেড দীপক কুমার প্রমুখ। পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের কাছে একটি দাবি সংবলিত স্মারকলিপি প্রদান করে।

বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলনে হোস্টেল কর্মচারীরা

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত হোস্টেল কর্মচারীরা দশ দফা দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন ৬ সেপ্টেম্বর। কলকাতার বেঙ্গল চেম্বারস অফ কমার্সের সামনে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নারায়ণচন্দ্র লোহার, শশধর মল্লিক, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শুভাশিস দাস প্রমুখ। সংগঠনের সভাপতি সত্যেন মজুমদার, দেবাশিস ব্যানার্জী, সাবিত্রী হাঁসদা এবং নিমাই মজুমদারকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করে। সভা থেকে সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক সুনির্মল দাসের নেতৃত্বে পাঁচজনের প্রতিনিধি দল অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন অধিকারের কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি জানান, সরকারি নির্দেশনামা অনুযায়ী বেতন, ছুটি ও সমস্ত সুবিধা দিতে হবে। তাঁরা ২৪ ঘন্টা ডিউটি বন্ধ ও অবসরকালীন সমস্ত প্রাপ্য দেওয়ার দাবি জানান।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বি-শত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(১০)

ভাষা, সাহিত্য ও বিদ্যাসাগর

ভাষা হল ভাব প্রকাশের মাধ্যম, চিন্তা ও মননশীলতার বাহক। অক্ষরনির্ভর ভাষাকে ভিত্তি করে ইতিহাসের বিশেষ পর্যায়ে জন্ম নিয়েছে লিখিত সাহিত্য, যা মানুষকে গভীর ভাবে দেখতে শেখায়, চিনতে শেখায় তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে। তার অগ্রযাত্রাকে করে তরান্বিত। মননকে করে তোলে আরও ক্ষুরধার। সেই তীক্ষ্ণ মনন আবার ভাষাকে প্রভাবিত করে সমৃদ্ধ করে। নতুন সমৃদ্ধ ভাষা ফের সাহিত্যকে আরও ধারালো ও শক্তিশালী করে। এই হল ভাষা ও সাহিত্যের পরস্পরের পরিপূরক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক এবং সামগ্রিক সমাজের সাথে তার ওতপ্রোত যোগ। তাই যুগে যুগে সমাজের জন্য যাঁরা লড়াই করেন, আপামর জনজীবনের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভাবে দাঁড়িয়ে কঠিন সংগ্রাম করে সমাজকে বন্ধ্যাদশা থেকে মুক্ত করেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই কোনও-না-কোনও ভাবে নির্দিষ্ট ভাষা ও সাহিত্যকে গড়ে দিয়ে যান, সমৃদ্ধতর করে দিয়ে যান।

বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও তা অবিস্মরণীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ঘটেছে। যুগোপযোগী ভাষানির্মাণ, গদ্যে সহজবোধ্যতার সৃষ্টি, অনুবাদ শিল্প, আধুনিক কাব্যবৈশিষ্ট্য আলোচনা, তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনা, ক্ষুরধার সরস বিতর্ক-সাহিত্য রচনা, যথার্থ আত্মজীবনীর আঙ্গিক নির্মাণ, বিষয়োপযোগী ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা, বিশেষত বিতণ্ডাবাদীদের কুযুক্তিগুলিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দ্বারা ছত্রখান করা— ইত্যাদি সহ ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত বহু কিছুর ভিত তৈরি করে দিয়ে গেছেন বিদ্যাসাগরই। সামাজিক অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদে যে নিবন্ধ-প্রবন্ধ-প্রস্তাব ইত্যাদি তিনি লিখেছেন, সে সবের ভাষা এবং বাক্যবন্ধ যুক্তি-তর্কের আপাত নিরসতাকে অবলীলায় অতিক্রম করে পাঠকের হৃদয়ে তুমুল আলোড়ন তুলেছে।

বর্বর সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে রামমোহন যে বিতর্ক-সাহিত্যের সূচনা করেছিলেন, তাকে ভিত্তি করে এই বিশেষ আঙ্গিকটির খোলনলচে বদলে দিয়েছেন বিদ্যাসাগর। সেখানে শুধুই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর তথ্য-তর্ক-ব্যাখ্যা নেই। সে সব গৌণ করে মুখ্য হয়ে উঠেছে সমাজ অগ্রগতির স্বার্থে তাঁর হৃদয়মথিত আকুল আবেদন। বিধবাবিবাহ সমর্থক এক নিবন্ধে তিনি লেখেন, ‘‘হায়, কী পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিতবোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।’’ শব্দ-বাক্যের এই দ্যোতনা অসংখ্য ঘুমন্ত বিবেক জাগিয়ে তুলেছিল। নারীজীবনের এই হাহাকার যথার্থ সমাজশিল্পীর মতো মানুষের মরমে প্রবেশ করিয়েছিলেন তিনি। সে যুগে আর কে পেরেছেন এই কাজ? তাঁর সমান সাহিত্যিক আর কোথায়? শুধু তাঁর এই প্রেরণা নিয়েই পরবর্তী কালে বাংলায় অসংখ্য কাব্য-কাহিনী নির্মিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে সেই ধারা সার্থকতম

ভাবে সঞ্চারিত হয়েছে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অনুপম শৈলীতে। বেদনার বিষয়, এগুলিকে সংশ্লিষ্ট করে বিদ্যাসাগর-চর্চা বহুকাল অবহেলিত থেকেছে। এমনকি আজও বিশেষ গভীরে গিয়ে তার আলোচনা হয় না। যার ফলে সামগ্রিক ভাবে মানবসমাজে মহাসাগর সদৃশ বিদ্যাসাগরের বিশাল অবদান অনেকেই জানেন না। যদিও বিদ্যাসাগর নিছক সাহিত্যিক হওয়ার জন্য কখনই কলম ধরেননি। এদেশের মাটিতে জরাগ্রস্ত সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে ধাক্কা দিতে মানবতাবাদী প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা প্রসারের জন্যই তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন।

ভাষা, সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক অবদান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘‘বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্যসমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।... একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।’’ এই অসাধারণ মন্তব্যের অন্তর্নিহিত রহস্য আবশ্যিক ভাবে প্রত্যেক দেশবাসীর জানা দরকার।

বিদ্যাসাগরের জন্ম-শতকের একেবারে শুরু থেকে বাংলা গদ্যের নির্মাণকর্ম শুরু হয়েছিল। ১৮০০ সালে কলকাতায় ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সাহেব কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শেখাবার জন্য বাংলা পাঠ্যবইয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান উইলিয়াম কেরী সেই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বেতন দিয়ে বাঙালি পণ্ডিতদের সাহায্য চান তিনি। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু প্রমুখ বাংলা গদ্য রচনায় সচেষ্ট হন। তারপর এলেন রামমোহন রায়। গদ্যের নমুনাগুলিতে তিনি দেখলেন নিয়মনীতির বিশৃঙ্খলা এবং সেই হেতু চলনে জড়তা ও পাঠকাঠিন্য। কারণ তেমন কোনও বাংলা ব্যাকরণের পূর্ণাঙ্গ বই নেই। তাই তিনি ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ (১৮৩৩) লিখলেন। তাতে আগের তুলনায় ভাষায় কিছুটা গতি এল। সে সময় অক্ষয়কুমার দত্তও গদ্যগঠনের এই ঐতিহাসিক প্রচেষ্টায় সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু সাহিত্যের ভাষা নির্মাণে তখনও অপেক্ষার অবকাশ রয়ে গেল।

ধাপে ধাপে এই প্রচেষ্টাগুলির ধারাবাহিকতায় ছেদ ঘটিয়ে ১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর প্রকাশ করলেন ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’। মার্জিত, পরিচ্ছন্ন, সাবলীল ভাষা। কোথাও কোনও বাগাড়ম্বর নেই, জড়তা-আড়ষ্টতা নেই। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়, ‘‘বেতাল বঙ্গ সাহিত্যে এক নবযুগের সূত্রপাত করিল।’’ অনেকের মনে হতে পারে, বিদ্যাসাগর হঠাৎ বেতালকাহিনী লিখতে গেলেন কেন? সাহেবদের তাগিদে বাংলা পাঠ্যবই লিখতে হবে বলে কি তড়িঘড়ি যা হোক একটা কিছু লিখে দিলেন তিনি? বাস্তবে ব্যাপারটা কোনও ভাবেই সেরকম নয়। মূল সংস্কৃত এবং তার থেকে হিন্দিরূপ ‘বেতাল পচ্চিশি’কে বিদ্যাসাগর বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সামাজিক চিন্তা-ভাবনার সাথে সঙ্গতি রেখেই। নিছক একটা গ্রন্থরচনা বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য নয়। মূলগ্রন্থের পাশে যদি বিদ্যাসাগরের বেতালকে রাখা যায় তো স্পষ্টই চোখে পড়ে, প্রাচীন সাহিত্যটির আদিরসাত্মক যাবতীয় বর্ণনা তিনি সযত্নে পরিহার করেছেন। দেবভাষায় লেখা বলে যা আছে সবই আমদানি করেননি। এবং এই পদ্ধতিতে তিনি অনুবাদ শিল্পের ভিত্তিও গড়ে তোলেন। এই গ্রন্থে তাঁর অত্যন্ত পরিশীলিত সাহিত্যবোধের অসামান্য প্রমাণ মেলে। তাই এই বই সেদিন বাঙালি পাঠকের হৃদয় জয় করে নিয়েছিল। রমেশচন্দ্র দত্তের ভাষায়, বিদ্যাসাগর ‘‘নূতন বাঙ্গলা ভাষায় সেই গল্প সেই ভাব প্রকাশ করিলেন, নিজের হৃদয়গুণে, নিজের প্রতিভাবলে সেই গল্পগুলি মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়া বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উচ্চতম স্থানে স্থাপন করিলেন।’’ একই সাথে তিনি বললেন, ‘‘ঈশ্বরচন্দ্রের একটি সঙ্কল্প সাধিত হইল— নির্মল সুমার্জিত বাঙ্গলা গদ্যের সৃষ্টি হইল।’’

পরের বছর তিনি প্রকাশ করলেন ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’। বাংলা ভাষা ও গদ্যের সমৃদ্ধিতে এই বইও মাইল ফলকের ভূমিকা নিয়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষায় ইতিহাস রচনাতেও এই বই অগ্রদূত। বিদ্যাসাগর এক সময় বলেছিলেন, ‘‘ভারতবর্ষের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার সমস্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি’’। তিনি দেখেছিলেন, কলহনের ‘রাজতরঙ্গিনী’ ছাড়া লিখিত ইতিহাস প্রায় নেই। আবার, তাঁর সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী মনন এও দেখেছিল যে, ‘রাজতরঙ্গিনী’ বইটি ‘সর্বসাধারণ-লোকসংক্রান্ত’ নয়। এখানে তাঁর যথার্থ ইতিহাস চেতনাও স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ মার্শম্যান সাহেবের ‘আউটলাইন্স অফ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল’-এর কয়েকটি অধ্যায় অবলম্বনে লিখিত হলেও যথারীতি এখানেও বিদ্যাসাগরের স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত উজ্জ্বল। তিনি শুধু ওই রচনার উপর নির্ভর করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই অন্যান্য বহু সূত্র থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন। সে কারণেই সিরাজদ্দৌলাকে অত্যাচারী বললেও, অন্ধকূপ-হত্যা যে তিনি ঘটাননি, তা বিদ্যাসাগর লিখেছেন। নন্দকুমারকে মার্শম্যান দুরাচার বলেছেন। বিদ্যাসাগর তার সাথে যোগ করেছেন অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদেরও। তিনি লিখেছেন, ‘‘নন্দকুমার দুরাচার ছিলেন বটে, কিন্তু ইম্পে ও হেস্টিংস তাহা অপেক্ষা অধিক দুরাচার, তাহাতে সন্দেহ নাই।’’ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বে দাঁড়িয়ে আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে এই দৃঢ় মানসিকতা শুধু তৎকালীন সমাজকেই আন্দোলিত করেনি, ভাষার ঋজুতাকেও প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিষয়বস্তু (কন্টেন্ট) সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণাই আঙ্গিক (ফর্ম)-কে শক্তিশালী করতে পারে, যদি কোনও হীন কারণে লেখক আপস না করেন। বিদ্যাসাগর নানা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে, বারবার যাচাইয়ের মাধ্যমে নিজের ধারণাকে স্বচ্ছ করে তুলেছিলেন এবং বলিষ্ঠ ভাবে তাকে প্রকাশ করতেও বিন্দুমাত্র আপস করেননি। তাই বিদ্যাসাগরের হাত ধরে এদেশে যথার্থ ইতিহাস চেতনা এবং বাংলা ভাষা ও গদ্য এক অভূতপূর্ব তেজোদ্দীপ্ত সৌন্দর্য লাভ করতে শুরু করল।

১৮৪৯ সালে বিদ্যাসাগর প্রকাশ করলেন ‘জীবনচরিত’। রবার্ট ও উইলিয়ামস চেম্বার্স-এর ‘বায়োগ্রাফিজ’-এ বিশ্বের নানা ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংকলিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর সেখান থেকে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখ বিশেষ কয়েকজনকে বেছে নিয়েছেন। এঁদের জীবন এবং কর্মকাণ্ডকে বর্ণনা করতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই নতুন শব্দ ও পরিভাষার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সে কাজে বহু পরিশ্রম করে, নানা জনের সাথে একাধিকবার পরামর্শ করে যথাসম্ভব সুবোধ্য শব্দ ও পরিভাষা নির্মাণ করেছেন বিদ্যাসাগর। যদিও গ্রন্থের ভূমিকায় (বিজ্ঞাপনে) তিনি লিখেছিলেন যে, এত চেষ্টাতেও তিনি তৃপ্ত নন। বোঝা যায় সমাজে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কী গভীর ভাবে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এবং সে জন্য যা যা প্রয়োজন, উপযুক্ত সহজ-সরল-সুবোধ্য ভাষা, সুন্দর-সাবলীল গদ্য, সব তিনি প্রায় একা হাতেই সংগঠিত করে গেছেন। কোন কোন ব্যক্তিত্বের জীবনসংগ্রামের কথা জানলে বাংলার ছেলেমেয়েরা জড়তা-অন্ধতা-কুসংস্কার ইত্যাদির নাগপাশ ছিন্ন করতে উৎসাহ পাবে, সেই কথা বিবেচনা করেই বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। জরাজীর্ণ সমাজকে ভাঙার উপযুক্ত চরিত্র-ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর। (চলবে)

শিক্ষক দিবসে প্রতিবাদ মিছিল শিক্ষকদের

শিক্ষকদের প্রতি সরকারি অবমাননা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠান বয়কট করে প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হলেন প্রাথমিক শিক্ষকরা। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ডাকে কলকাতায় ধর্মতলার লেনিন মূর্তি থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত মিছিলের পর থিওজফিক্যাল সোসাইটি হলে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়ির তন্ময় মুখার্জী ভবনেও প্রতিবাদ সভা হয়। সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা শিক্ষা ধ্বংসকারী নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি প্রত্যাহার ও অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালুর দাবি জানান। সমিতির পক্ষ থেকে, শিক্ষাদান বহির্ভূত সমস্ত দায়িত্ব থেকে শিক্ষকদের মুক্ত করা, পর্যাপ্ত সংখ্যায় স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ, কেন্দ্রীয় হারে ডিএ প্রদান, পে কমিশন চালু করা ইত্যাদি দাবি জানানো হয়। সম্প্রতি শিক্ষক আন্দোলনে পুলিশি নির্যাতন এবং পুলিশের হাতে শিক্ষিকাদের শ্লীলতাহানিরও নিন্দা করা হয় সভায়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

মোটরভ্যান চালকদের নদিয়া জেলা সম্মেলন

৭ সেপ্টেম্বর কৃষ্ণনগর পৌরসভা দ্বিজেন্দ্র মঞ্চে সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক

ইউনিয়নের নদীয়া জেলা চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সারা জেলা থেকে আড়াইশো জনেরও বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মোটরভ্যান চালাতে গিয়ে যে সব প্রশাসনিক ও আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, প্রতিনিধিরা তাঁদের বক্তব্যে তা তুলে ধরেন। বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সম্পাদক কমরেড প্রবীর দে, জেলা সভাপতি কমরেড দীপক চৌধুরী, মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস এবং রাজ্য সভাপতি কমরেড সুজিত ভট্টশালী। নেতৃবৃন্দ বলেন, রাজ্য সরকার মোটরভ্যান তুলে দিয়ে ই-রিক্সা চালু করতে চাইছে, যা দিয়ে মাল পরিবহণ করা যাবে না, তার দামও অনেক বেশি।

সম্মেলনে আমির হোসেনকে সভাপতি, দীপক চৌধুরীকে সম্পাদক, মোসলেম গাজীকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩৪ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

হাসপাতালে ব্যাপক চার্জ বাড়াল বিজেপি সরকার

প্রতিবাদে ত্রিপুরায় বিক্ষোভ এসইউসিআই(সি)-র

বিজেপি পরিচালিত ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর ৬ সেপ্টেম্বর এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, এখন থেকে সরকারি হাসপাতালে

চিকিৎসার জন্য সকলকেই টাকা দিতে হবে। আউটডোরে টিকিট চার্জ হবে দরিদ্রদের জন্য ১০ টাকা এবং এপিএল-দের জন্য ২০ টাকা। অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা চার্জ মারাত্মক বাড়িয়েছে। বেড চার্জ বাড়িয়ে প্রায় বেসরকারি নার্সিংহোমের মতো করে দিয়েছে। অন্ত্যোদয় যোজনাভুক্ত হতদরিদ্র রোগীদের আইসিইউ-তে বেড ভাড়া দিতে হবে প্রতিদিন ৩০০ টাকা করে, অন্যদের দিতে হবে ৬০০ টাকা। খরচ জোগাতে না পেরে বিনা চিকিৎসায় সম্প্রতি এক দরিদ্র দিনমজুরের মৃত্যু হয়।

এই বিপুল চার্জ বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং মৃত দিনমজুরের পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) ১১ সেপ্টেম্বর আগরতলায় বিক্ষোভ দেখায়। দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক বলেন, ত্রিপুরায় সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা খুব অনুন্নত। মহকুমা হাসপাতালে তো বটেই এমনকী জেলা হাসপাতালগুলিতেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। রেফারেল হাসপাতাল জিবিপিতেও উন্নত মানের চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। ত্রিপুরায় কংগ্রেস শাসনে, পরবর্তী সময়ে সিপিএম শাসনে জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ব্যবস্থাটুকুও করা হয়নি। ফলে সাধারণ মানুষকে রোগ সারাতে অন্য রাজ্যে যেতে হচ্ছে। দুর্বল পরিকাঠামোর মধ্যেও সামান্য যতটুকু চিকিৎসা হত এবার বিজেপি সরকার সেখানেও আঘাত হানল। তারা সমস্ত পরিষেবায় ফি ধার্য করেছে এবং আগের ফি কয়েকগুণ বাড়িয়েছে। অবিলম্বে এই চার্জ বৃদ্ধি রদ করতে হবে।

হাসপাতালের এই চার্জ বৃদ্ধিতে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ রাজ্যের বিজেপি সরকারের উপর ভয়ানক ক্ষুব্ধ। এই ঘটনা ত্রিপুরা সহ গোটা দেশের মানুষের কাছে বিজেপির চূড়ান্ত জনবিরোধী চরিত্র তুলে ধরে। নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। শেষপর্যন্ত চাপে পড়ে ১০ সেপ্টেম্বর সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চার্জ বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তিটি চূড়ান্ত নয়।

ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর প্রতিবাদে ডিএসও

২৭ আগস্ট পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বাজকুল কলেজে ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উপর টিএমসিপি দুষ্কৃতীরা ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনে এবং ডিএসও-র কলেজ ইউনিট সম্পাদক, সভাপতি সহ ৫ জন ছাত্রকে গুরুতর ভাবে জখম করে। আক্রান্ত ছাত্ররা সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ভাগবানপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও প্রশাসন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি

শুধু নয় আক্রান্ত ছাত্রদেরই মিথ্যা মামলায় ফাঁসাচ্ছে। এর প্রতিবাদে ৫ সেপ্টেম্বর জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও।

শতাধিক ছাত্রছাত্রীর বিক্ষোভের ফলে পুলিশ সুপার ডি এস ও-র প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করে পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।

এগরায় পরিচারিকাদের দাবিপত্র পেশ

পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা শহরে কয়েকশো পরিচারিকা কাজ করেন। অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও তাঁরা বাঁচার মতো মজুরি পান না, তাঁদের নেই শ্রমিকের স্বীকৃতি ও সামাজিক মর্যাদা। পরিচারিকাদের শ্রমিকের স্বীকৃতি, পরিচয়পত্র দেওয়া, বাঁচার মতো মজুরি ও সবেতন

ছুটি ঘোষণা, মদ ও মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করা, পরিচারিকা সন্তানদের শিক্ষা ও চিকিৎসা সরকারি পরিচালনায় করা, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড প্রদান, প্রভিডেন্ড ফান্ড-এর আওতাভুক্ত করা প্রভৃতি দাবিতে ৩ সেপ্টেম্বর এগরা এসডিও-কে ডেপুটেশন দেয় সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির এগরা শাখা। নেতৃত্ব দেন সবিতা দাস, অসীমা পাহাড়ী প্রমুখ।

রাজ্যের স্কুল ও মাদ্রাসার বঞ্চিত করণিকরা আন্দোলনে

এ রাজ্যের সরকারি স্কুল ও সরকারি মাদ্রাসার করণিকরা তীব্র বঞ্চনার শিকার। সারা জীবন চাকরি করলেও এঁদের নেই কোনও পদোন্নতির সুযোগ। অথচ কাজের কোনও সীমা পরিসীমা নেই এঁদের। স্কুলে শিক্ষাবহির্ভূত সব কাজই এঁদের দিয়ে করানো হয়।

এই কর্মচারীদের নিয়োগ-যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশ। কিন্তু বর্তমানে ইন্টারনেট এবং কম্পিউটার ভিত্তিক বহু কাজ এঁদের করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই পদটি উচ্চমাধ্যমিক এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ভিত্তিক করার দাবি রাখে। এবং তারই ভিত্তিতে বেতনক্রম বাড়ানো উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল অ্যান্ড মাদ্রাসা ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তন্ময় সরকারের দাবি, কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কিম এর আওতায় এনে করণিকদের কর্মজীবনের ৮, ১৬ এবং ২৫ বছরে পরবর্তী উচ্চতার পে-স্কেল পাওয়ার সুযোগ দিতে হবে। সাথে সাথে এলডিসি থেকে ইউডিসি এবং তারপর হেডক্লার্ক পদে উন্নীত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। তাঁদের আরও দাবি কাজের সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রকাশ করা। সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর ১০ দফা দাবিতে কলকাতায় বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে।

আইসিডিএস কর্মী ও সহায়িকাদের হুগলি জেলা সম্মেলন

৮ সেপ্টেম্বর শেওড়াফুলি সুরেন্দ্রনাথ ভবনে ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের হুগলি জেলা প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আইসিডিএস কর্মী ও সহায়িকাদের সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি, ন্যূনতম ১৮০০০ টাকা বেতন, সামাজিক সুরক্ষা, পিএফ, ইএসআই ও পেনশনের দাবি নিয়ে প্রতিনিধিরা সোচ্চার হন। দাবি ওঠে প্রতিটি সেন্টারের নিজস্ব ভবন ও শৌচাগার তৈরির এবং মা ও শিশুদের উপযুক্ত পুষ্টির জন্য খাদ্যের মান ও বরাদ্দ বাড়ানোর। এলাকায় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক হয়রানির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করার আওয়াজ তোলেন উপস্থিত ৫৫০ জন প্রতিনিধি। বিভিন্ন ব্লকের ১৮ জন তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। প্রধান বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। ইউনিয়নের রাজ্য নেত্রী লীলা শী বক্তব্য রাখেন। শিপ্রা মিত্রকে সভাপতি, রীতা মাইতিকে সম্পাদক ও মহুয়া ভট্টাচার্যকে কোষাধ্যক্ষ করে ৪১ জনের জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com